অন্নদাশঙ্কর রায়

ডি এম লাইব্রেরী
কলকাতা

শ্রীকরুণাকুমার হাজরা

সুহৃদ্বরেষু

নিবেদন

প্রবন্ধ আর নিবন্ধ, চিঠিপত্র আর ইনটারভিউ, জীবনী আর স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনী আর রিপোর্ট—সবরকম লেখা মিলিয়ে যে বই তার নাম "দিশা"।

"দিশা" পড়ে কেউ দিশা পাবেন কিনা জানিনে, কারণ আমিও আজকের জগতে দিশাহারা হয়ে দিশার সন্ধানী। তা হলে লিখি কেন? লিখি যখন দেখি যে বিশেষ একটি পরিস্থিতিতে আমার অনুপস্থিত থাকা উচিত নয়। আর লেখকের উপস্থিতি মানেই তো লেখা। ও ছাড়া আর কী ভাবে লেখক উপস্থিত থাকতে পারে?

যতবারই আমি এ দায় এড়াতে চেয়েছি ততবারই এ দায় আমার ঘাড়ে এসে চেপেছে। একদা আমার সংকল্প ছিল শুধু সৃষ্টির দায় নিয়েই ক্ষান্ত থাকব। লোকে বলবে পলায়নবাদী, বেশ তো, আমি তাই। স্বভাবতই আমি এস্‌কেপিস্ট। কিন্তু সম্পাদক, পত্রলেখক ও আরো পাঁচজনে আমাকে পালাতে দিলে তো?

ইন্‌টেলেকচুয়াল বলে গণ্য হবার বিপত্তি এই যে প্রয়োজনের সময় দেশের লোককে দিশা দেখাতে হয়। জ্ঞানবুদ্ধির আলোয়। এটাও একপ্রকার বাধ্যবাধকতা।

অন্নদাশঙ্কর রায়

২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭০

সূচী

নিশা

প্রমথ চৌধুরীর মন

প্রমথ চৌধুরীর মন সেই মন যাকে জাগিয়ে দিয়ে যান ডিরোজিও। যার প্রথম অভিব্যক্তি 'ইয়ং বেঙ্গল' নামক বৈতালিক দল।

এ-মন ঠিক সেই মন নয় যার কীর্তি উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে। কারণ এ-মন ধর্মাশ্রয়ী বা দেশাশ্রয়ী নয়। এ-মন দর্শনাশ্রয়ী। আর সে-দর্শন আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শন।

এ-মন জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা করে চলে। মীমাংসায় উপনীত হয় না বা হতে চায় না। কোনো মীমাংসাই এর কাছে চরম বা পরম নয়।

ডিরোজিওর শিষ্যরা ইংরেজীতেই লিখতেন, বাংলা তাঁদের মাতৃভাষা হলেও সে-ভাষায় আত্মপ্রকাশ করতে উৎসাহ পান নি। যাঁরা পরে বাংলায় মন দিয়েছিলেন তাঁরা ধর্মাশ্রয়ী বা দেশাশ্রয়ী হয়েছিলেন। সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক কাজ হত ইংরেজীতেই লেখা। সে-কাজ তিনি পারতেনও। কারণ ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন পয়লা-নম্বর। তাঁর মতো কৃতী ছাত্ররা বিলেত যেতেন, ব্যারিস্টার হতেন, সিভিলিয়ান হতেন, ইংরেজীতে লিখতেন, এই তো ছিল রীতি।

কিন্তু পুরোপুরি নয়। রমেশচন্দ্র ছিলেন ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় সব্যসাচী। প্রমথ চৌধুরী এক-আধবার ইংরেজীতে লিখলেও বাংলাতেই আত্মপ্রকাশ করে তৃপ্তি পান। ততদিনে বাংলা গদ্যও অনেকটা প্রস্তুত হয়েছিল। কোদাল চালানোর কাজ রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ করে রেখেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁদের হাত থেকে কোদাল নিয়ে দেশের জমি থেকে তাজা সবুজ